কুইলটিং ফর জাস্টিস

এশিয়া জাস্টিস অ্যান্ড রাইটস

সহযোগিতায়

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

AJAR
ASIA JUSTICE AND RIGHTS

Liberation War Museum
Bangladesh

কুইলটিং ফর জাস্টিস

আন্তর্জাতিক বিচার প্রক্রিয়া অনুধাবন করার জন্য একটি সচিত্র নির্দেশিকা

এশিয়া জাস্টিস অ্যান্ড রাইটস

এবং

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

২০২১

প্রথম মুদ্রণঃ জুলাই ২০২০

অনূদিত সংস্করণ ২০২৩ সালে ঢাকায় প্রথম প্রকাশিত হয়

লেখা এবং সম্পাদনা দলঃ

Galuh Wandita, Laetitia Bonnet, Nicole Janisiewicz, Pia Conradsen, Nasrin Akter, Shakila Yesmin, and Mohammad Pizuar Hossain.

বাংলা অনুবাদক

Luthfunnahar Shancyi and Mohammad Pizuar Hossain.

সেলাই এবং নকশাঃ

রোহিঙ্গা নারী শরনার্থী

চিত্রণ এবং প্রচ্ছদঃ

Ign Ade

কুইলটিং ফর জাস্টিসঃ

আন্তর্জাতিক বিচার প্রক্রিয়া অনুধাবন করার জন্য

একটি সচিত্র নির্দেশিকা

© এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ২০২১।

অন্যথায় উল্লেখ করা ব্যতীত, এই বইয়ের বিষয়বস্তু ক্রিয়েটিভ কমন্স

(বিশেষায়িত, অ-বাণিজ্যিক, মৌলিক, আন্তর্জাতিক ৪.০) লাইসেন্সের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুনঃ https://asia-ajar.org

যদি কোনো তথ্য এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস

এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ছাড়া অন্য কোনো সত্ত্বার হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে তথ্যগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্স

সাপেক্ষে নয়।

মুখবন্ধ

মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে।
কিন্তু, ন্যায়বিচার পাওয়ার যাত্রা প্রায়শই জটিল এবং বিভ্রান্তিকর প্রক্রিয়ার সাথে
হাতে হাত মিলিয়ে আসে,
বিশেষ করে যখন তার সাথে আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া জড়িত থাকে।

২০১৭ সালে, ৭২৫,০০০ এরও অধিক রোহিঙ্গা শরণার্থী
মিয়ানমারের ব্যাপক নৃশংসতা থেকে বাঁচতে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।
রোহিঙ্গা নারী শরণার্থীদের তাদের অধিকার এবং
ন্যায়বিচারের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত করার জন্য
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর (এলডব্লিউএম) এবং এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস (এজেএআর) কাজ করে চলেছে।

এই বইটিতে রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচারের অগ্রগতির সাথে সম্পৃক্ত
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা হয়েছে,
যেখানে একটি কাল্পনিক চরিত্র, অন্যান্যদের সাথে তার অভিজ্ঞতা এবং বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে
বিভিন্ন তথ্য আলোচনা করে। কাল্পনিক চরিত্রের গল্প উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে
এজেএআর এবং এলডব্লিওএম কক্সবাজারে নারী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে
কাজ করার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছে।
গল্পের পাশাপাশি যে চিত্রগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে
তা রোহিঙ্গা নারী শরণার্থীদের দ্বারা তৈরিকৃত কাঁথা থেকে নেওয়া হয়েছে,
যার নকশাগুলি তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার স্মৃতি এবং আশা আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়ে তুলেছে।

এলডব্লিউএম এবং এজেএআর যে সকল রোহিঙ্গা নারী শরণার্থীদের সাথে কাজ করছে
তাদের অবদানকে স্বীকার করে এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জানায়।
রোহিঙ্গা নারীদের নানান গল্প এবং তাদের ন্যায়বিচার সম্পর্কে জানার ও প্রচার করার ইচ্ছা
এই বইটিকে আরো আনুপ্রানিত করবে।

কয়েক বছর আগে,
আমার স্বপ্ন ছিল
সিত্তওয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে
আইন বিষয়ে পড়ার।

কিন্তু অকস্মাৎ
একটা বিপর্যয় ঘটে যায়।

আমার পরিবার
এবং আমাকে
মাঝরাতে
পালাতে হয়েছিল।

অনেক দিন হাঁটার পর,
একটা নদী পার হয়ে
আমরা নিরাপদ স্থানের সন্ধান পেলাম।

এখন, আমি শরণার্থী শিবিরে থাকি।
জীবন কঠিন, তবুও আমি
আমার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবো।

আমার বাবা একজন মাঝি (রোহিঙ্গা ক্যাম্প লিডার)।
তিনি প্রায়শই আমাদের পূর্ববর্তী আবাসস্থলে এবং
বিশ্বের অন্যান্য অংশে কী ঘটছে
সেই সংক্রান্ত নানান তথ্য এবং বই নিয়ে আসেন।

আমার বন্ধুরা এবং আমি প্রতিদিন একত্রিত হই
মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচার সম্পর্কে জানতে
এবং এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে।

এরা হলো সোরায়া ও নুর বেগম।

এটা বোঝা কঠিন,

কিন্তু আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি।

আমরা যা শিখেছি তা নকশীকাঁথায়

সেলাইয়ের মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য স্থির করেছি।

২০১৭ সালে রাখাইনে সংগঠিত সহিংসতায় যা ঘটেছে,

সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে

এবং ন্যায়বিচারের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে

সমগ্র বিশ্বই কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ৫টি পন্থা অবলম্বন করেছে।

এসব পন্থার মধ্যে রয়েছে

মিয়ানমারের অন্যান্য জাতিগত অঞ্চলে

সংঘটিত অপরাধগুলোর দিকে নজর দেয়া।

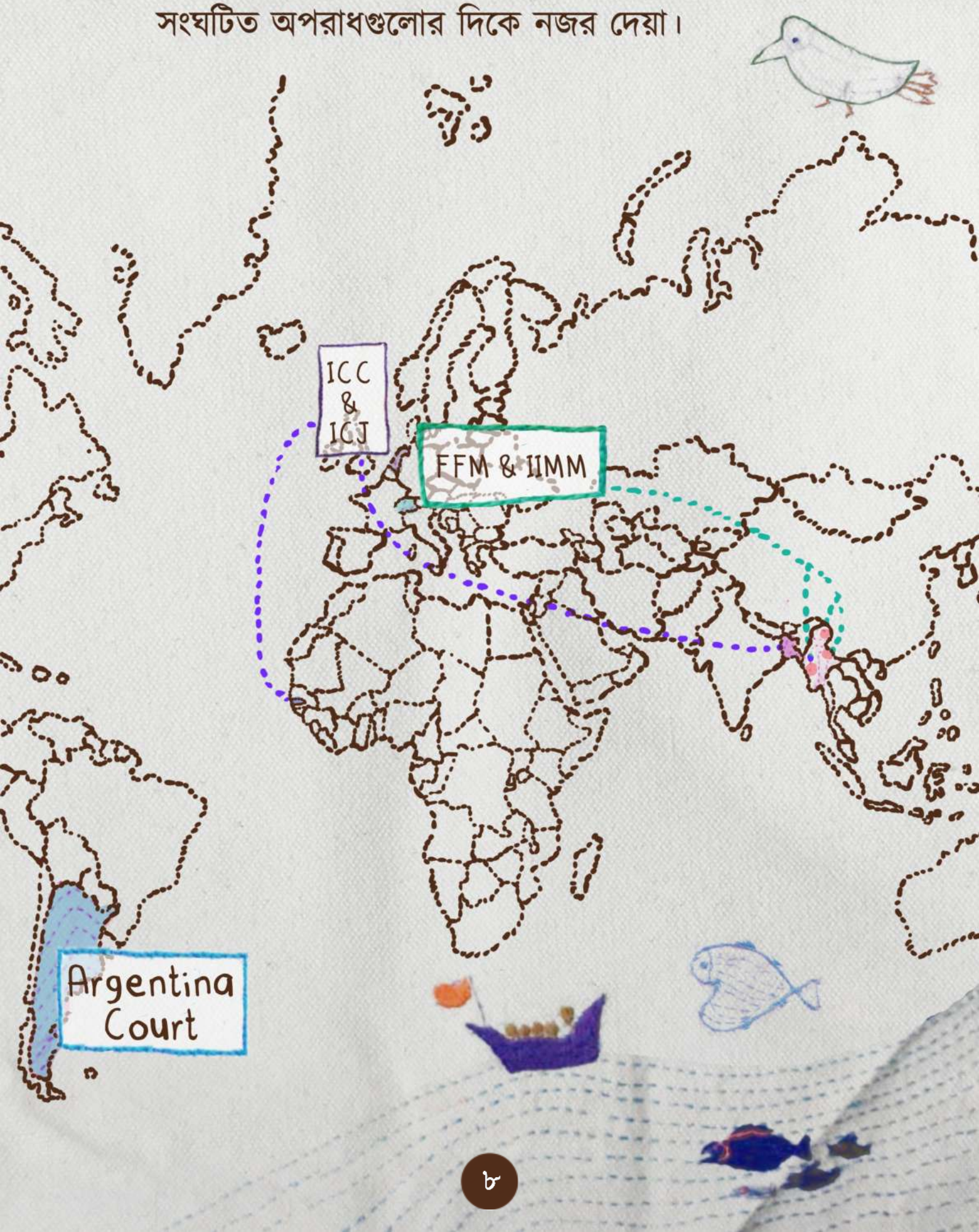

আমরা জানতে পেরেছি যে,

৫টি পৃথক আন্তর্জাতিক তদন্ত সংস্থা বা আদালত

মিয়ানমারে সংঘটিত অপরাধের দিকে নজর দিচ্ছে।

FFM

২০১৭ সালে,

জাতিসংঘ মিয়ানমারের বিষয়ে

আন্তর্জাতিক স্বাধীন তথ্য-অনুসন্ধান মিশন

(এফএফএম) প্রতিষ্ঠা করে।

IIMM

২০১৮ সালে,

জাতিসংঘ মিয়ানমারের জন্য

স্বাধীন অনুসন্ধানী ব্যবস্থা

(আইআইএমএম) প্রতিষ্ঠা করে।

ICC

২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে,

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

(আইসিসি) তদন্ত শুরু করে।

... মিয়ানমারে যে অপরাধগুলো সংঘটিত হয়েছিল

তা অনুসন্ধান করা।

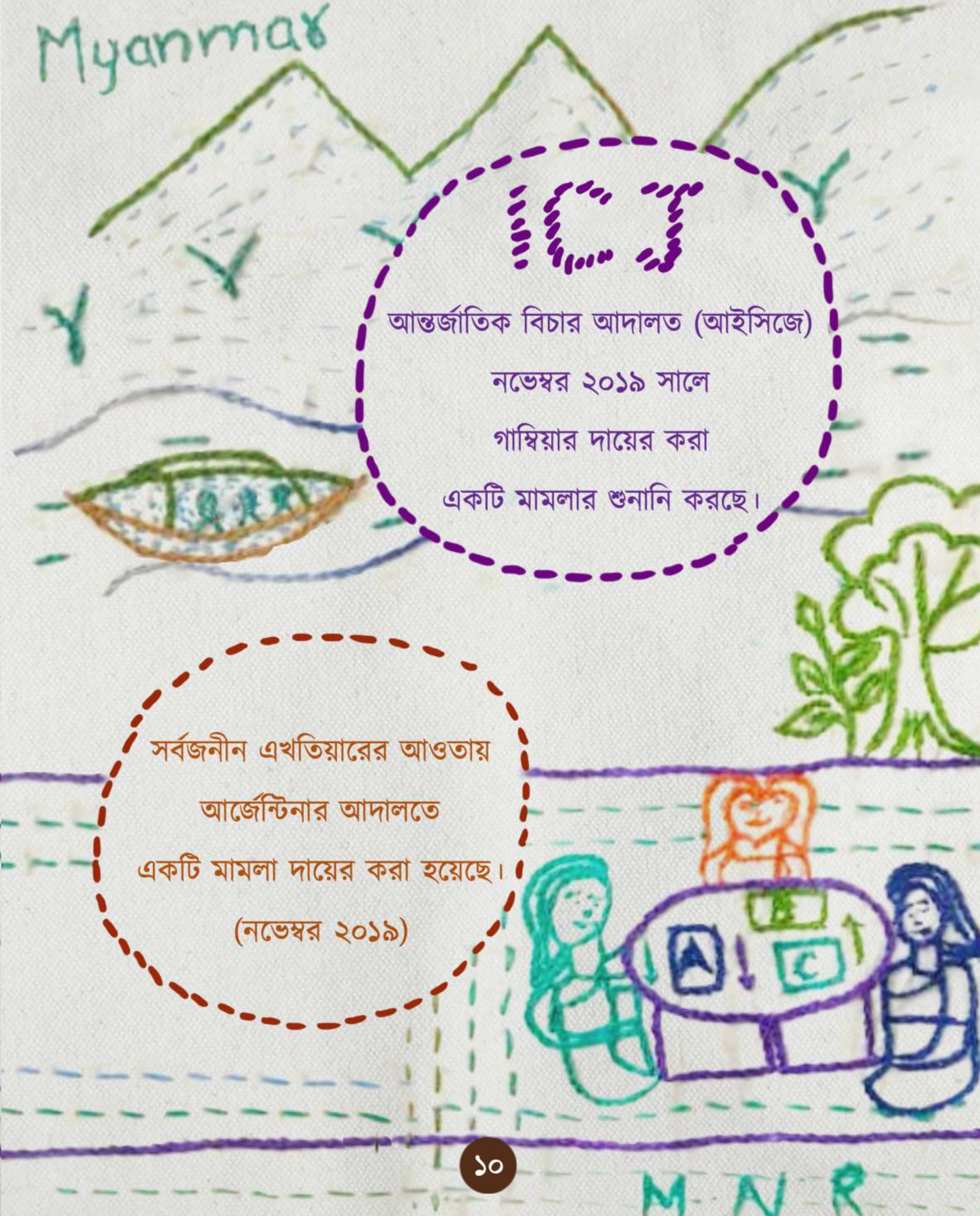

এফএফএম (ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন)

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক ২০১৭ সালের ২৪শে মার্চ
এফএফএম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এটি ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে
অনুসন্ধানের কাজ শেষ করে
প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত
মিয়ানমারের জন্য
স্বাধীন অনুসন্ধানী ব্যবস্থার
(আইআইএমএম) কাছে হস্তান্তর করে।

২০১১ সাল থেকে
মিয়ানমারে প্রাথমিকভাবে
সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী
এবং জাতিগত বিভিন্ন
সশস্ত্র গোষ্ঠীসমূহ যেসকল মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটিয়েছে,
বিশেষ করে রাখাইন, কাচিন
এবং উত্তর শান রাজ্যে,
এফএফএম সেসকল
মানবাধিকার লঙ্ঘন অনুসন্ধান করেছে।

কমিশনারবৃন্দ ছিলেন - ইন্দোনেশিয়ার
মারজুকি দারুসমান (প্রধান),
শ্রীলঙ্কার রাধিকা কুমারস্বামী এবং
অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস্টোফার ডমিনিক সিডোটি।

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে
এফএফএম-এর প্রতিবেদনটি
প্রকাশিত হয়
(৪৪৪ পৃষ্ঠা) ।

২০১৯ সালের আগস্ট মাসে, এফএফএম
মিয়ানমার সেনাবাহিনীর
ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং মিয়ানমারে সংঘটিত
যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ক
একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে
একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন
প্রকাশ করা হয়।

মূল অনুসন্ধানসমূহ

তাঁতমাদও-রা রাখাইন রাজ্যে
রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা এবং
কাচিন, শান ও রাখাইন রাজ্যে যুদ্ধাপরাধ ও
মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটিত করেছে।

রাখাইন রাজ্যে, তাঁতমাদও-রা
"ক্লিয়ারেন্স অপারেশন" পরিচালনা করে
যার ফলে ৭২৫,০০০ এরও বেশি রোহিঙ্গা
বাংলাদেশে পালিয়ে যায় এবং
গণহত্যা ও গণধর্ষণ সহ ১০,০০০ জন
(একটি রক্ষণশীল অনুমান) মৃত্যুবরণ করে।

এফএফএম মিয়ানমারে ব্যাপক ঘৃণাবাচক বক্তব্যও নথিভুক্ত করেছে।

এফএফএম
ছয়জন সিনিয়র কমান্ডারকে
অপরাধের জন্য
সবচেয়ে বেশি
দায়ী বলে
চিহ্নিত করেছে।

এফএফএম সামরিক বাহিনীর ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং
সেই সাথে সংঘাতে যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক
সহিংসতার প্রয়োগ নথিভুক্ত করেছে।

এফএফএম আহ্বান জানিয়েছেঃ

মিয়ানমারের কমান্ডার-ইন-চিফ,
সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইং এবং
তার শীর্ষ সামরিক নেতাদের দ্বারা সংঘটিত
গণহত্যা, মানবতা বিরোধী অপরাধ এবং
যুদ্ধাপরাধের তদন্ত ও বিচার করা।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ দ্বারা
মিয়ানমারকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে
(আইসিসি) রেফার করা বা
একটি সাময়িক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা।

মিয়ানমারের বিষয়ে একটি
আন্তর্জাতিক স্বাধীন তদন্ত ব্যবস্থা (আইআইএমএম) তৈরি করা।

চিহ্নিত ব্যক্তিবর্গের সম্পদ জব্দ এবং
ভ্রমণ নিষিদ্ধ করা সহ তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা।

মিয়ানমারের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা জারি করা।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক
মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর জন্য
সব ধরনের আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা বন্ধ করা।

ভুক্তভোগীদের সহায়তার জন্য
জাতিসংঘ দ্বারা একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা।

এফএফএম এর কিছু স্পষ্ট প্রভাবঃ

এটি শুধুমাত্র ব্যক্তিদেরকেই নয়,
বরং একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে
তাঁতমাদও-কেও নিরীক্ষণ করেছে।

মূল প্রতিবেদনটি
মানবাধিকার লঙ্ঘনের
বিভিন্ন ধরণ তুলে ধরেছে।

এফএফএম এর ম্যান্ডেট অনুযায়ী
এটি সমগ্র মিয়ানমার,
বিশেষ করে রাখাইন, কাচিন
এবং উত্তর শান রাজ্যগুলোতে তদন্ত করেছে।

কমিশনাররা হলেন
এফএফএম এর দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ।

এফএফএম এর দ্বারা সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণ
আইআইএমএম এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে,
যা আইসিজে এবং আইসিসি-ও
ব্যবহার করতে পারে।
কিন্তু সেখানে
কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল।
যেমন, এফএফএম অপরাধীদের
বিচার বা শাস্তি দিতে পারে না।
এফএফএম শুধুমাত্র সুপারিশ করতে পারে।
এটি সরকারকে তার সুপারিশ বাস্তবায়নে
বাধ্য করতে পারে না।
এফএফএম এর ম্যান্ডেট
সেপ্টেম্বর ২০১৯ এ শেষ হয়েছে।

আমাদের কুইল্ট দেখে
এফএফএম এর সভাপতি
মারজুকি দারুসমান লিখেছেনঃ

“কক্সবাজারে প্রথম সফরে আমরা
ইউএনডিপি এর উদ্যোগে শিশুদের জন্য তৈরি করা লার্নিং সেন্টারে যাই।
সেখানে আমরা গণহত্যার সময়কার হেলিকপ্টারের
ভয়ঙ্কর ছবি (শিশুদের দ্বারা আঁকা) দেখেছি।
ছবিগুলো অনেক ভিন্ন, রঙিন, প্রাণবন্ত যা আশার সূচনা প্রকাশ করে।
রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে ধন্যবাদ জানাই আমার দ্বিতীয় সফরের মাধ্যমে
রোহিঙ্গা বিষয়টি বিশ্বের কাছে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য,
যেক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে ছিল। আশ্চর্যজনক প্রতিক্ষেপণ।
আমি বিশ্বাস করি আপনারা
এমন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাবেন এবং যত্নশীল থাকবেন।”

মারজুকি দারুসমান,
৯ অক্টোবর ২০১৯।

এফএফএম বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর,
জাতিসংঘ আইআইএমএম
(মিয়ানমারের জন্য স্বাধীন তদন্ত প্রক্রিয়া)
গঠন করে।

আইআইএমএম ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে গঠন করা হয়েছে
এবং আগস্ট ২০১৯ এ কাজ শুরু করেছে।
এটি জেনেভাতে অবস্থিত।

আইআইএমএম এফএফএম এর কাজের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়।
এফএফএম তাদের সংগ্রহ করা তথ্য
আইআইএমএম এর কাছে হস্তান্তর করে।

আইআইএমএম এর প্রধান হচ্ছেন
নিকোলাস কৌমজিয়ান,
যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন আন্তর্জাতিক প্রসিকিউটর।

এর আগে তিনি ইস্ট তিমুর ও কম্বোডিয়ার
আদালতে কাজ করেছেন।

আইআইএমএম এর দলে
তদন্তকারী,
বিশ্লেষক,
অনুবাদক
এবং আইনজীবী থাকবে।

আইআইএমএম প্রতিষ্ঠিত হয়েছেঃ

তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে।
২০১১ সাল থেকে এটি
মিয়ানমারে সংঘটিত
সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ এবং
আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের
তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ,
একত্রীকরণ,
সংরক্ষণ এবং
বিশ্লেষণ করে।

এবং

আন্তর্জাতিক আইনের মান অনুযায়ী
ন্যায্য ও স্বাধীন ফৌজদারি কার্যধারা
সহজতর ও ত্বরান্বিত করার জন্য
নথিপত্র প্রস্তুত করে, যা জাতীয়,
প্রাদেশিক বা আন্তর্জাতিক আদালত বা ট্রাইব্যুনালে
এবং ভবিষ্যতে এই অপরাধগুলির
এখতিয়ার থাকতে পারে
এমন আদালতে ব্যবহৃত হতে পারে।

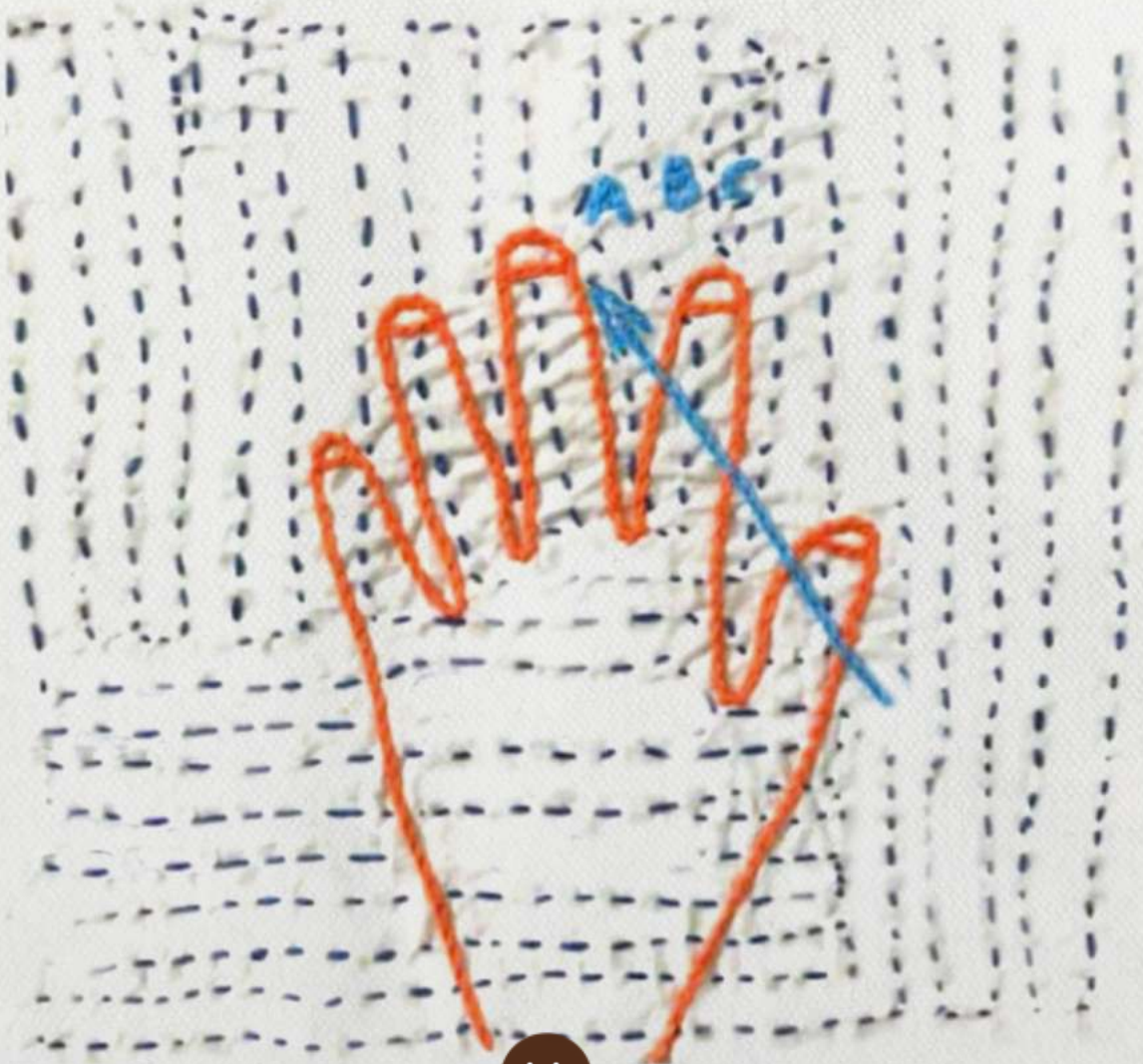

নথিপত্রের তথ্য সংগ্রহের জন্য

আইআইএমএম এর উচিতঃ

১। অপরাধের জন্য সর্বাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উপর নজর দেয়া।

২। ঐ ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত নির্দিষ্ট অপরাধসমূহ চিহ্নিত করা।

৩। ক্রিমিনাল রেস্পন্সিবিলিটির (অপরাধমূলক দায়িত্ব)
প্রকারগুলি নির্দিষ্ট করা
(যেমন, কমান্ড বা
সুপেরিয়ার রেস্পন্সিবিলিটি)।

৪। অপরাধ এবং
দ্বায়ী ব্যক্তিদের মধ্যে
সংযোগ প্রকাশ করে
যেসব বিষয়
তা অন্তর্ভূক্ত করা।

আইআইএমএম ভবিষ্যতের মামলাগুলোকে
আদালতে পরিচালনার প্রক্রিয়াকে আরো সহজ করবে,
কারণ এটি অন্যদের ব্যবহারের জন্য
প্রমাণ সহ নথিপত্র প্রস্তুত করবে।

আইআইএমএম এর ম্যান্ডেট ২০১১ থেকে শুরু হলেও
ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে।
এটি মিয়ানমারের ঘটনা ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করবে
এবং ভবিষ্যতে অপরাধের জন্য
দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানে সহযোগিতা করবে।

আইআইএমএম এফএফএম এর কাজের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।
এফএফএম তাদের সংগ্রহ করা তথ্য
আইআইএমএম এর কাছে হস্তান্তর করেছে।

আইআইএমএম দ্বারা সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণসমূহ
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) এবং
সর্বজনীন এখতিয়ারের নীতির অধীনে (আর্জেন্টিনার মতো)
অন্যান্য আদালতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
এটি আন্তর্জাতিক বিচার আদালতেও (আইসিজে)
ব্যবহার করা যেতে পারে।

সিভিল সোসাইটি সংস্থাগুলি
আইআইএমএম এর কাজে সহযোগিতা করতে পারে এবং
এটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং নথি সরবরাহ করতে পারে।

অন্যদিকে,

আমাদের বুঝতে হবে যেঃ

আইআইএমএম

কোনো অপরাধীদের

বিচার বা শাস্তি দিতে পারে না।

এটি কেবল প্রমাণ সংগ্রহ

এবং নথিপত্র প্রস্তুত করতে পারে।

আইআইএমএম কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল নয়।

এটি কোন বিচার কার্যক্রম করতে পারে না।

এটি তার সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণ ট্রাইব্যুনালের কাছে হস্তান্তর করবে

যা ভবিষ্যতে অপরাধীদের

বিচারের আওতায় আনতে সহযোগিতা করবে।

২০২১ সালের গ্রীষ্মের সময়ে,
আইআইএমএম মিয়ানমারে
প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

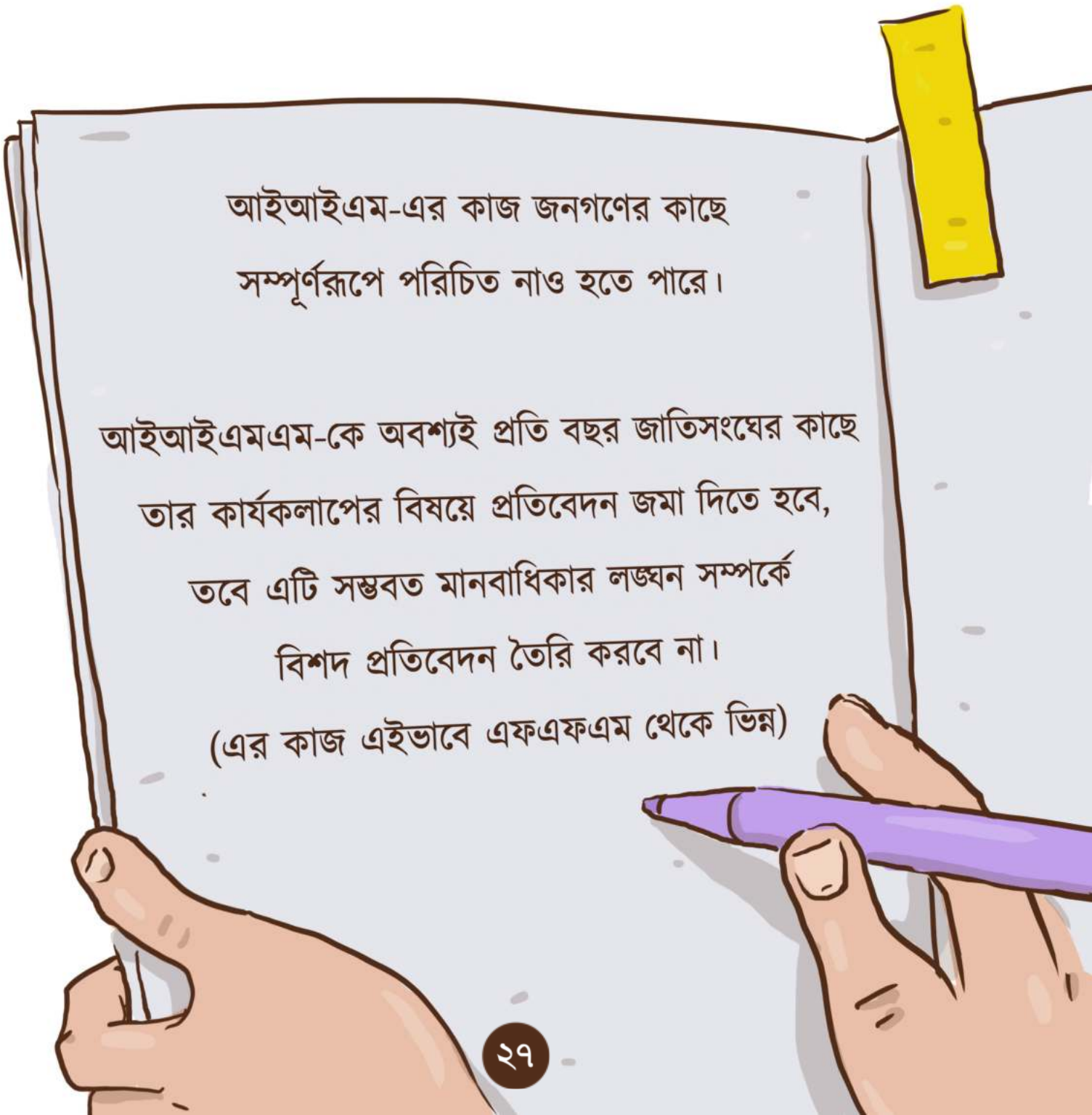

আইআইএমএম-এর মিয়ানমারের আইনি
বা নীতি সংস্কারের পক্ষে সুপারিশ করার সম্ভাবনা কম।

আইআইএমএম-এর প্রচার করার ক্ষমতা
এবং সাধারণ জনগণকে এর কাজ সম্পর্কে
অবহিত করার ক্ষমতা সীমিত হতে পারে।

আইআইএমএম-কে সাহায্য করার জন্য
আমরা কি করতে পারি?

হয়তো আমরা পারিঃ

১. আইআইএমএম-কে তথ্য এবং নথি সরবরাহ করা।

২. ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীদের আইআইএমএম-কে প্রমাণ দিতে সাহায্য করা।

৩. সাধারণ জনগণের কাছে আইআইএমএম-এর কাজ ব্যাখ্যা করা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রত্যাশা পরিচালনা করতে সাহায্য করা।

এছাড়াও, আমরা করতে পারিঃ

১. আইআইএমএম যাতে জাতিগত প্রেক্ষাপট, সংস্কৃতি এবং ভাষার দক্ষতার সাথে সাথে মানবাধিকার দলিলীকরণে স্থানীয় প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মী অন্তর্ভুক্ত করে তা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ এবং আইআইএমএম-এর প্রধানকে অনুধাবন করানো।

২. আইআইএমএম-এর কাজে সহযোগিতাকারী ব্যক্তি এবং সাক্ষীগণ যেন উপযুক্ত চিকিৎসা এবং মানসিক সহায়তা পান তা নিশ্চিত করতে আইআইএমএম-এর কাছে তদবির করা।

আইসিসি (আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত)

আইসিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নেদারল্যান্ডস এর হেগ শহরে।

রোম সংবিধিতে (যা গুরুতর অপরাধের শিকার

ব্যক্তিদের বিচার প্রদানের জন্য

একটি চুক্তি) যেসব দেশ স্বাক্ষর করেছে,

তাদের দ্বারা আইসিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মিয়ানমার আইসিসির সদস্য নয়।

এটি রোম সংবিধিতে স্বাক্ষর করেনি,

যা আইসিসি তৈরির চুক্তিঃ

সুতরাং, এটি সেই চুক্তির একটি "রাষ্ট্রীয় পক্ষ" নয়।

এর মানে মিয়ানমার

আইসিসির এখতিয়ারও গ্রহণ করেনি।

বাংলাদেশ ২০১০ সাল থেকে
আইসিসির রোম সংবিধির একটি সদস্য রাষ্ট্র।
এটি আইসিসির এখতিয়ার গ্রহণ করেছে।

২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে, আইসিসির প্রসিকিউটর
আইসিসির বিচারকদের নিকট রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত
অপরাধের বিষয়ে আইসিসির এখতিয়ারের ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন।
আইসিসির প্রসিকিউটর উল্লেখ করেছেন যে,
রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ
বাংলাদেশের সীমান্তের ওপারে সংঘটিত হয়েছে।

৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে, আইসিসি রুল জারি করে যে,
এটি বাংলাদেশের ভূখণ্ডে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত
অপরাধের বিরুদ্ধে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে,
কারণ বাংলাদেশ রোম সংবিধির একটি রাষ্ট্র পক্ষ।

২০১৯ সালের জুলাই মাসে, আইসিসির প্রসিকিউটর
বিচারকদেরকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের তদন্তের জন্য
অনুমোদন চেয়ে আবেদন করেছিলেন,
যার মধ্যে মানবতা বিরোধী অপরাধও ছিল,
যেগুলি বাংলাদেশের সাথে পর্যাপ্তভাবে সম্পৃক্ত।

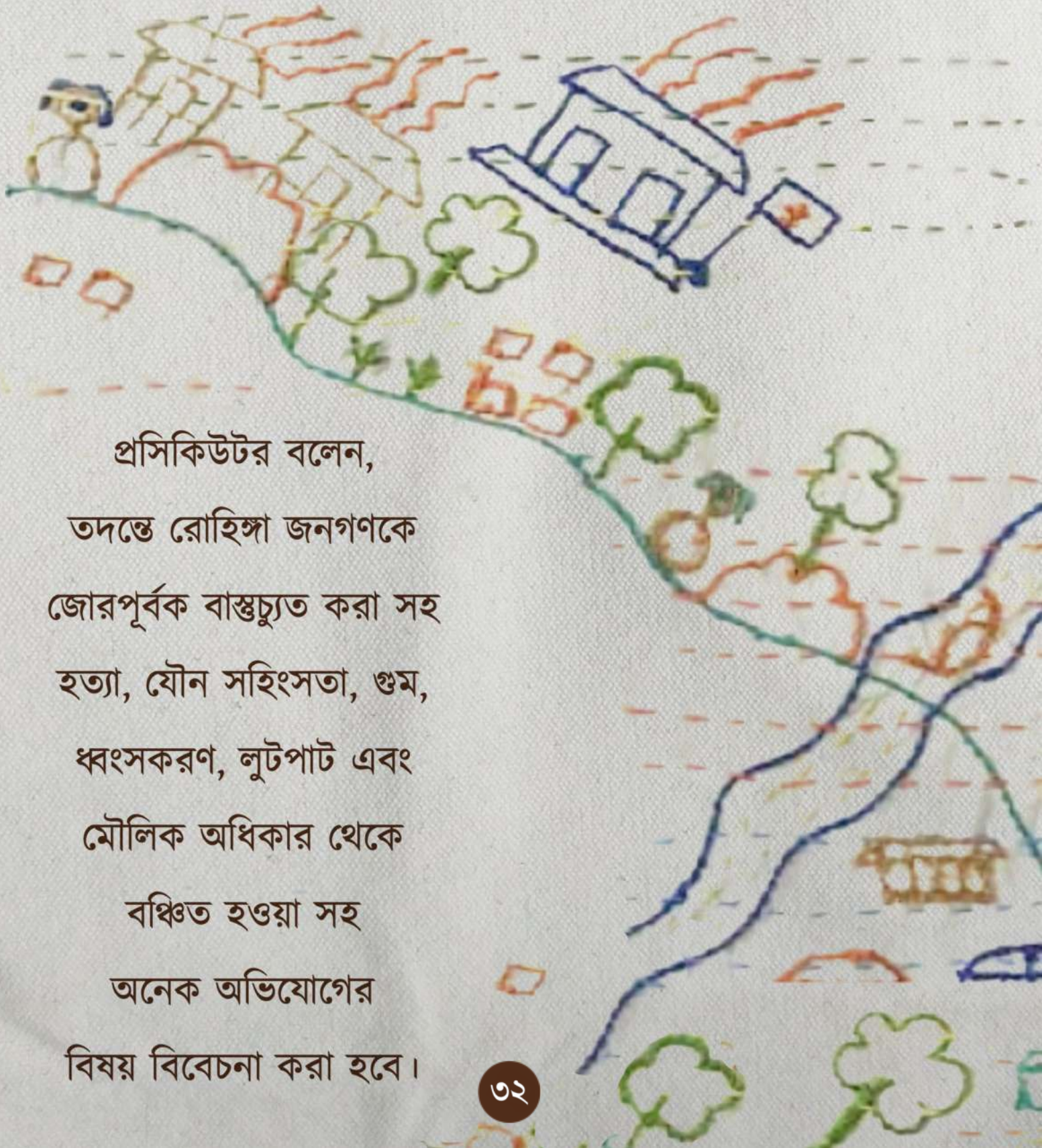

প্রসিকিউটর বলেন,
তদন্তে রোহিঙ্গা জনগণকে
জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা সহ
হত্যা, যৌন সহিংসতা, গুম,
ধ্বংসকরণ, লুটপাট এবং
মৌলিক অধিকার থেকে
বঞ্চিত হওয়া সহ
অনেক অভিযোগের
বিষয় বিবেচনা করা হবে।

২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে, আইসিসি বিচারকরা প্রসিকিউটরকে ভবিষ্যতের অপরাধ সহ যেকোন অপরাধের জন্য তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতা দিয়েছেন, যতক্ষণ এটি আইসিসির এখতিয়ারের মধ্যে থাকে এবং অন্তত বাংলাদেশের ভূখন্ডের অংশে সংগঠিত হয়।

মিয়ানমার আইসিসির সদস্য নয়।
এটি যেই রোম সংবিধির মাধমে আইসিসি তৈরি হয়েছে
সেটিকে গ্রহণ করেনিঃ তাই এটি রোম সংবিধির "রাষ্ট্র পক্ষ" নয়।
এর মানে মিয়ানমার আইসিসির এখতিয়ার গ্রহণ করেনি।

আইসিসির পরিচালনাকারী আইন অনুসারে,
যখন রাষ্ট্রীয় পক্ষ নয় এমন একটি দেশে
অপরাধ সংঘটিত হয়, তখন সেই দেশটি
সেই বিশেষ পরিস্থিতির জন্য
আইসিসির এখতিয়ার মেনে নিতে পারে।
যদি দেশটি আদালতের এখতিয়ার মানতে না চায়,
তবে শুধুমাত্র জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ
আইসিসির কাছে সেই পরিস্থিতি
অর্পণ করতে পারে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের
রেফারেল বা পরিস্থিতি অর্পণ করা
এই মুহূর্তে রাজনৈতিক কারণে সম্ভব নয়।

চীনের মতো নিরাপত্তা পরিষদের কিছু দেশ
পরিষ্কার করেছে যে তারা এতে
ভেটো বা নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে।

আইসিসি
তার তদন্ত শেষ করতে
কত সময় নেবে?

প্রসিকিউটর একটি আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করলে,
এটি শেষ করার জন্য কোন সময়সীমা নেই এবং
এটি কয়েক বছর সময় নিতে পারে।
প্রসিকিউটর প্রমাণ সংগ্রহ করবেন এবং
সিদ্ধান্ত নেবেন যে এক বা একাধিক অপরাধীর বিরুদ্ধে
মামলা আনয়নের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ আছে কি-না।
যদি থাকে, প্রসিকিউটর এক বা একাধিক
গ্রেফতারী পরোয়ানার জন্য আবেদন করবে।

গ্রেফতারী পরোয়ানা কি?

গ্রেফতারী পরোয়ানা হল
বিচারকদের দ্বারা জারি করা একটি নথি
যা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে
(অর্থাৎ, অপরাধ করেছে বলে সন্দেহ করা ব্যক্তিকে)
গ্রেপ্তার করতে নির্দেশ দেয়।
গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রকাশ্য বা গোপন হতে পারে
(অর্থাৎ সিলমোহরের অধীনে দায়ের করা)।
এর অর্থ হল গ্রেফতারী পরোয়ানা থাকলেও
জনগণ হয়তো তা জানবে না।

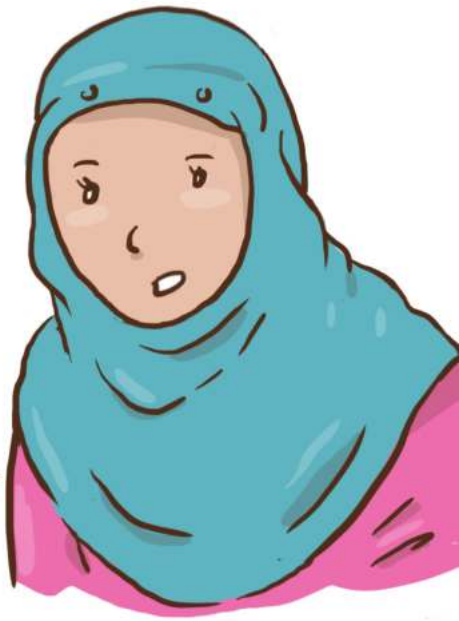

এবং মনে রাখবেন
আইসিসির গ্রেফতার করার ক্ষমতা নেই।
শুধুমাত্র রাষ্ট্র (সরকার) সন্দেহভাজনদের
গ্রেফতার করতে পারে।

গ্রেপ্তারি পরোয়ানায়
নামধারী কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তি যদি
এমন কোনো দেশে ভ্রমণ করে
যেটি আইসিসির রাষ্ট্রপক্ষ,
সে রাষ্ট্রটির উচিত
সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা,
কিন্তু এটি অতীতে সবসময় ঘটেনি।
তবুও, সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা
আইসিসির রাষ্ট্রপক্ষ দেশে ভ্রমণের
ঝুঁকি নেবে এমন সম্ভাবনা কম।

আসামিদের গ্রেফতার না করলে
তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা সম্ভব না।
অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে
আইসিসিতে কোনো বিচার হয় না।
তাই এটা খুবই সম্ভব যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির
ব্যাপক পরিবর্তন না হলে কোনো বিচার হবে না।

আইসিসিকে সাহায্য করতে আমরা কী করতে পারি?

আমরা পারিঃ

১. সাধারণ জনগণের কাছে আইসিসির সীমাবদ্ধতা এবং সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করা।

২. প্রসিকিউটরকে তথ্য এবং নথিপত্র প্রদান করা।

৩. ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীদের আইসিসিকে (আইআইএমএম এর মাধ্যমে সহ) তথ্য দিতে সাহায্য করা এবং তারা প্রক্রিয়াটি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করা।

আমরা আরও করতে পারিঃ

১. প্রসিকিউটরকে অপরাধীদের জবাবদিহিতার একটি রুপ হিসাবে গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রকাশ করতে বলার বিষয়ে চিন্তা করা।

২. আইসিসিকে অনুরোধ করা যাতে এটি মায়ানমারের সকল সম্প্রদায়ের কাছে সর্বসাধারণের তথ্য প্রচার এবং প্রদান করে।

৩. আইসিসির ট্রাস্ট তহবিলকে অনুরোধ করা যাতে এটি নির্যাতিত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য সহায়তা কার্যক্রম শুরু করে।

আইসিজে

(আন্তর্জাতিক বিচার আদালত)

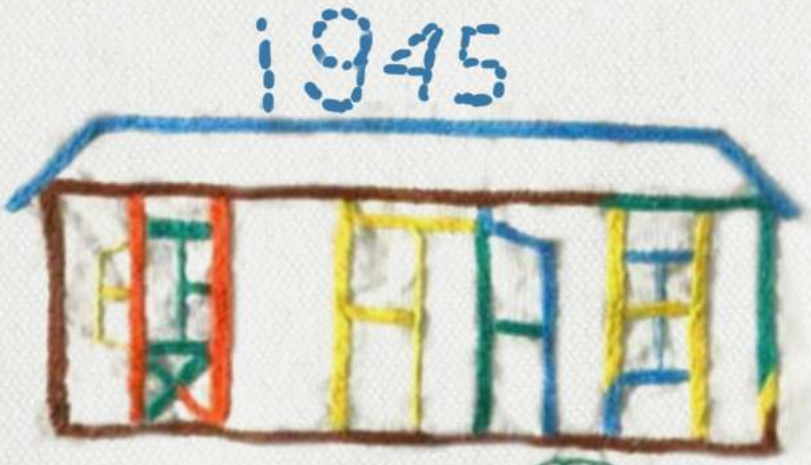

আইসিজে-কে
১৯৪৫ সালে
জাতিসংঘের আদালত হিসাবে
প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

এর ম্যান্ডেট হলোঃ

- দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে
আইনি বিরোধ নিষ্পত্তি করা,
উদাহরণস্বরূপ,
একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি
বা কনভেনশনের প্রয়োগ সম্পর্কিত
কোনো বিরোধ।

- জাতিসংঘের সংস্থাগুলো দ্বারা
নির্দেশিত আইনি প্রশ্নে
পরামর্শমূলক মতামত প্রদান করা।

মিয়ানমার জাতিসংঘের সদস্য

এবং গণহত্যা কনভেনশনের

একটি সদস্য রাষ্ট্র।

কনভেনশনটির অধীনে থাকা একটি সদস্য রাষ্ট্র

(অর্থাৎ, একটি দেশ যা গণহত্যা কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে)

যদি বিশ্বাস করে যে, অন্য সদস্য রাষ্ট্র

কনভেনশনটি বহাল রাখছে না,

তাহলে এটি আইসিজে-তে অভিযোগ দায়ের করতে পারে।

এর অর্থ হলো যে, অন্য একটি দেশ

যা গণহত্যা কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে

তা আইসিজের বিচারকদেরকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বা

অন্যান্য জাতিগত অথবা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে

গণহত্যা সংঘঠন করার জন্য

মিয়ানমারের দায় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে বলতে পারবে।

এবং ঠিক তাই হয়েছে।

২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর, একটি আফ্রিকান দেশ,
গাম্বিয়া, গণহত্যা কনভেনশনের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের জন্য
মিয়ানমারের বিরুদ্ধে
আইসিজে-তে আবেদন করেছে।

মিয়ানমারের বিরুদ্ধে অভিযোগে করা হয়েছে যে,
মিয়ানমার গণহত্যা সংঘটন করছে এবং
যারা এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত
তাদের প্রতিরোধ ও শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

২০১৯ সালের ১০-১২ ডিসেম্বর নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে
আইসিজের এখতিয়ার এবং "অস্থায়ী ব্যবস্থা" নিয়ে
আলোচনা করার জন্য
একটি প্রাথমিক শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

আইসিজে-তে কোনো মামলা প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায়
মামলার পক্ষসমূহকে আইসিজে জরুরীভাবে
যে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিতে পারে
তাকে অস্থায়ী ব্যবস্থা বলা হয়।

অস্থায়ী ব্যবস্থা

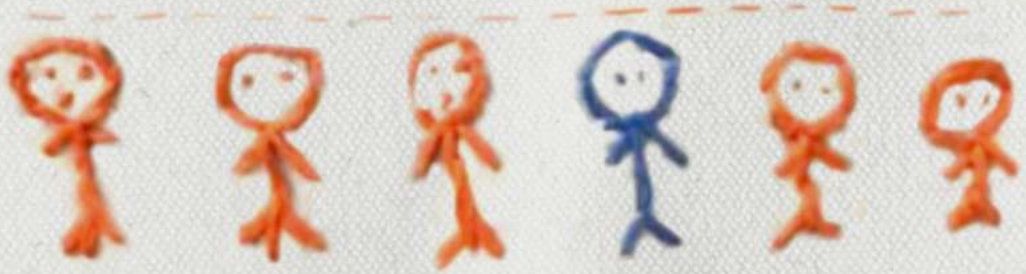

২০২০ সালের ২৩ জানুয়ারী, আইসিজে বিচারকরা
মিয়ানমারকে কিছু অস্থায়ী ব্যবস্থা
বাস্তবায়নের জন্য একটি আদেশ জারি করেন।

বর্তমানে এটি অজানা
আদালত কখন এই মামলার বিষয়ে
পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে
এবং চূড়ান্ত রায় পেতে
কয়েক বছর লাগতে পারে।

বিচারকরা ব্যাখ্যা করেছেন যে
তারা মিয়ানমারকে অস্থায়ী ব্যবস্থা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিচ্ছেন
কারণ সেখানে গণহত্যার গুরুতর ঝুঁকি রয়েছে।

সিদ্ধান্তটি সর্বসম্মত ছিল। অন্যকথায়,
মিয়ানমারের নিযুক্ত বিচারক সহ
প্যানেলের সকল বিচারক একমত হয়েছেন।

আইসিজে আদেশ দিয়েছে যেঃ

১. রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত
গণহত্যাজনিত অপরাধ,
যেমন হত্যা এবং
গুরুতর ক্ষতিসাধন প্রতিরোধে
মিয়ানমারকে সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

২. মিয়ানমারকে অবশ্যই
নিশ্চিত করতে হবে যে,
তার নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবাধীন
সামরিক বাহিনী এবং অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনী
গণহত্যাজনিত কোনো কাজ
সংগঠিত করবে না।

৩. মিয়ানমারকে
গণহত্যার তথ্য
সংরক্ষণ করতে হবে।

৪. মিয়ানমারকে অবশ্যই
৪ মাসের মধ্যে আইসিজে-তে
বিবরণী পেশ করতে হবে এবং
পরবর্তী সময়ে প্রতি ৬ মাস পর পর
মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত
বিবরণী পেশ করতে হবে।

জাতিসংঘের (ইউএন)
সনদ অনুযায়ী
এই সিদ্ধান্ত মিয়ানমারের জন্য
আইনত বাধ্যতামূলক।
মিয়ানমারকে এ আদেশ
মানতে হবে।

সিদ্ধান্তটি জাতিসংঘের
নিরাপত্তা পরিষদে
প্রেরণ করা হবে
যার ক্ষমতা রয়েছে
এই আদেশ বাস্তবায়নে
ব্যর্থ হলে পদক্ষেপ নেয়ার।

তাহলে, আইসিজে এবং
আইসিসির মধ্যে পার্থক্য কি?

আইসিজে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে
আইনি বিরোধ নিষ্পত্তি করে।
এটি সরকারের দায়ের দিকে
নজরদারী করে,
পৃথকভাবে অপরাধীদের
দায়ের দিকে নয়।

আইসিসি ব্যক্তিদের বিচার করে।
এটি পৃথকভাবে ব্যক্তিদের
অপরাধমূলক দায়ের দিকে নজর দেয়।

তাহলে,
এরপর কি হবে?

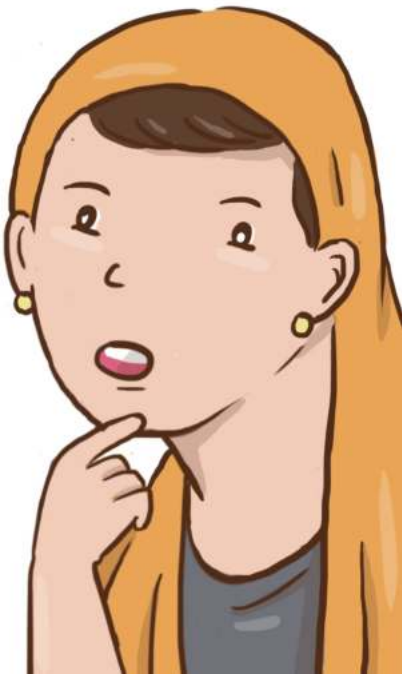

মামলা দায়ের করার সময় গাম্বিয়া যেসকল সমস্যা উত্থাপন করেছে
আইসিজে সেসকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়নি (তা হল মামলার "যোগ্যতা")।
আইসিজের মূল মামলার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে
কয়েক বছর সময় লাগতে পারে (তা হল "যোগ্যতা")।

তার আগে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া রয়েছে।

আদালত সিদ্ধান্ত দেয়ার সময়
মিয়ানমার গণহত্যা করেছে কি-না
সে সম্পর্কে ঘোষনা দিতে পারে,
মিয়ানমারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের
আদেশ দিতে পারে এবং
এই অপরাধের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়
তা নিশ্চিত করতে পারে।

সর্বজনীন এখতিয়ার

সাধারণত, দেশীয় আদালত বিচার করতে পারেঃ

- তাদের দেশে সংঘটিত অপরাধের।
- অন্য দেশে তাদের নাগরিকদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের।
- অন্য দেশে তাদের নাগরিকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের।

কিন্তু এটা বিরল।

কিছু দেশের আদালত
তাদের সর্বজনীন এখতিয়ার প্রয়োগ করে
কিছু গুরুতর অপরাধের বিচার করতে পারে।
সেক্ষেত্রে, অনেক সময়
অপরাধগুলো ভিন্ন দেশে
সংঘটিত হতে পারে
এবং আসামি অন্য দেশের
নাগরিকও হতে পারে ।

এই নীতিটি শুধুমাত্র অত্যন্ত গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়,
যে অপরাধগুলো এতটাই গুরুতর যে সেগুলো
সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে
অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং
সর্বজনীন উদ্বেগের বিষয় হিসেবে ধরা হয়।
এই ধরণের অপরাধের ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হয় যে,
ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য যেকোনো রাষ্ট্রের এখতিয়ার থাকা উচিত।

সর্বজনীন এখতিয়ারের নীতিটি প্রাথমিকভাবে
জলদস্যুতা এবং দাস ব্যবসার অপরাধ মোকাবেলায় ব্যবহৃত হয়েছিল।
আজকাল, এটি সবচেয়ে গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়,
যেমন যুদ্ধাপরাধ, মানবতা বিরোধী অপরাধ এবং গণহত্যা।

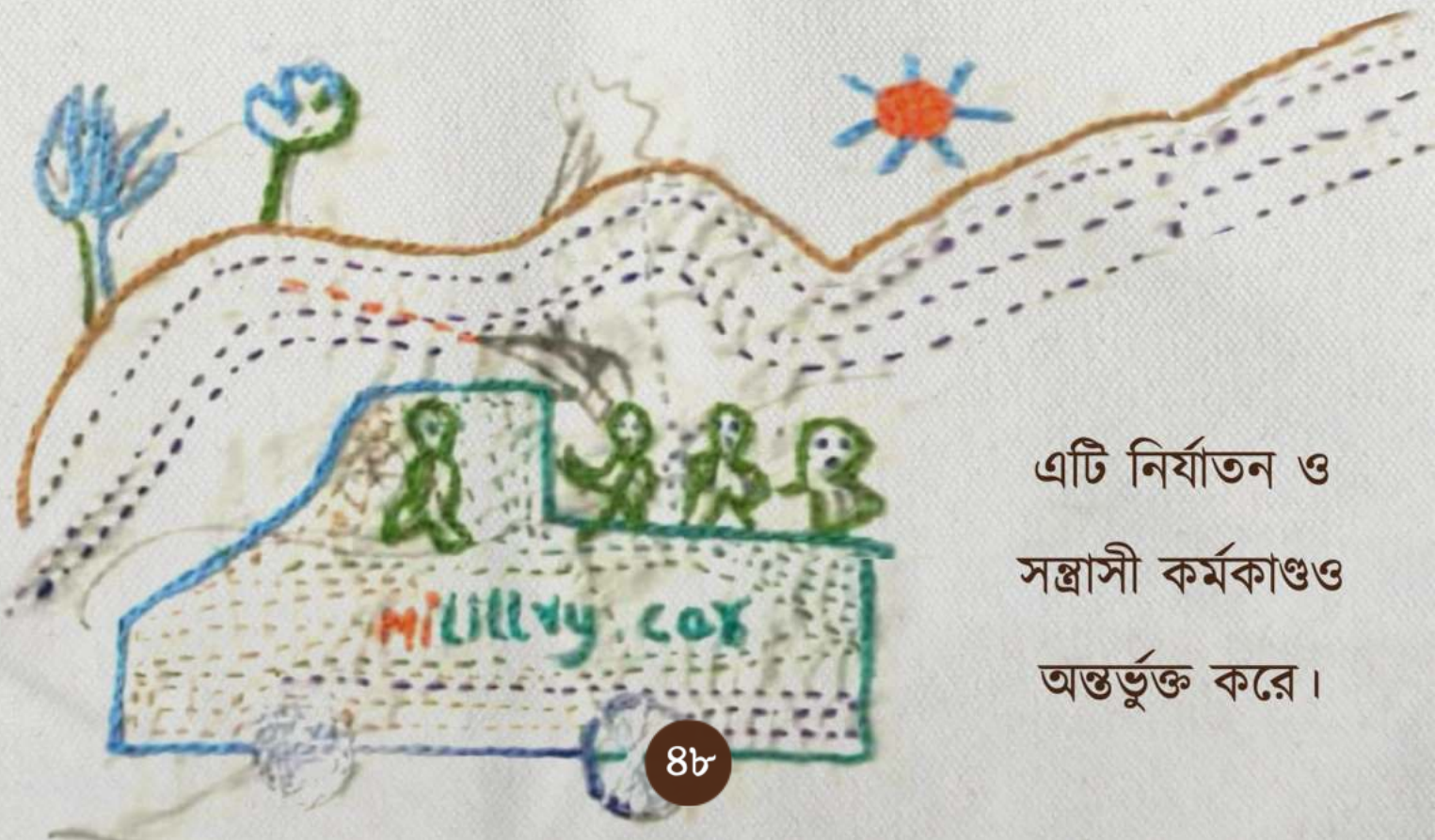

এটি নির্যাতন ও
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডও
অন্তর্ভুক্ত করে।

অনেক দেশ সর্বজনীন এখতিয়ারকে স্বীকৃতি দিয়ে
আইন প্রনয়ণ করেছে এবং
সেই ভিত্তিতে তাদের আদালতে
মামলা দায়ের করার
অনুমতি দিয়েছে।

দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে
বেলজিয়াম,
জার্মানি,
যুক্তরাজ্য, স্পেন,
অস্ট্রেলিয়া
এবং আর্জেন্টিনা।

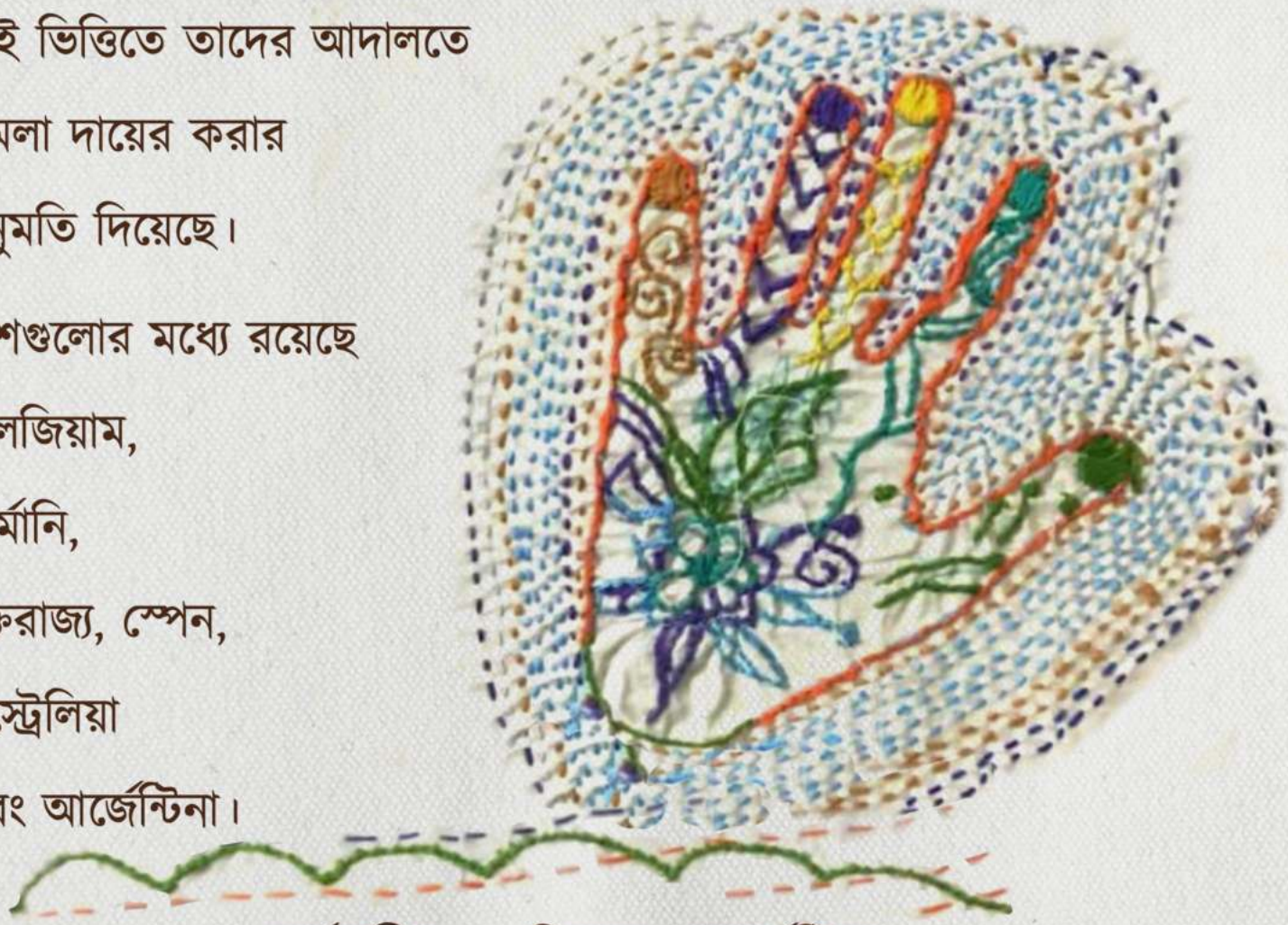

সর্বজনীন এখতিয়ারঃ আর্জেন্টিনা

মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলি ১৩ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে
আর্জেন্টিনার একটি আদালতে
একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে,
অভিযোগ করেছে যে
মিয়ানমারের সরকার এবং সেনাবাহিনী
রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা
এবং মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছে।

মামলাটি আর্জেন্টিনার আদালতে দায়ের করা সম্ভব হয়েছিল
কারণ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ সহ দেশটির আইনে
সর্বজনীন এখতিয়ারের নীতিটি
অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আর্জেন্টিনার আদালত অতীতে চীনের ফালুন গং আন্দোলন এবং
স্পেনের প্রাক্তন স্বৈরশাসক ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কোর
শাসনের বিষয়বস্তুতেও
সর্বজনীন এখতিয়ার ব্যবহার করে
মামলা গ্রহণ করেছে।

২০১৯ সালে দায়ের করা অভিযোগে
মিয়ানমারের শীর্ষ সামরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের
মানবতা ও গণহত্যার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য অপরাধের জন্য
তদন্ত ও বিচারের দাবি করা হয়েছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে

সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইং এবং

অন্যান্য সামরিক নেতাদের পাশাপাশি রাষ্ট্র উপদেষ্টা

ডাও অং সান সু চি, রাষ্ট্রপতি উইন মিন্ট এবং

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হিতিন কিয়াও এবং থেইন সেইন ।

এটি মঙ্ক ইউ উইরাথু এবং রাজনীতিবিদ নে মায়ো ওয়াই সহ

বেশ কিছু বেসামরিক নাগরিকের তালিকাও করে।

মামলাটি দায়ের করা হয়েছে এই সকল ব্যক্তিদের

অপরাধী, সহযোগী এবং অপরাধ গোপনকারী হিসেবে

ব্যক্তিগত অপরাধমূলক দায় নিশ্চিত করার জন্য ।

এটা মিয়ানমার রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে নয়।

তাহলে কীভাবে এটি
অন্যান্য আদালত
এবং তদন্তের সাথে সম্পর্কিত?

আর্জেন্টিনার মামলাটি
ব্যক্তিগত দায় সম্পর্কিত
(কিন্তু আইসিজের মামলাটি
রাষ্ট্রীয় দায় সম্পর্কিত)।
এটি মিয়ানমারের ভূখণ্ডে সংঘটিত
রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে অপরাধসমূহকে
সম্বোধন করে (যদিও আইসিসি
বাংলাদেশের ভূখণ্ডে সংঘটিত
অপরাধের মধ্যে সীমাবদ্ধ)।

আর্জেন্টিনার আদালত ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন
(এফএফএম) এবং মিয়ানমারের জন্য
স্বাধীন তদন্ত ব্যবস্থা (আইআইএমএম) দ্বারা সংগৃহীত
তথ্য-প্রমাণ সরবরাহ করার জন্য আইআইএমএম-কে
অনুরোধ করতে পারে। এতে আদালতের কাজ
অনেক সহজ হবে।

আর্জেন্টিনার মামলাটির অগ্রগতি হলে
তা মিয়ানমারের ওপর রাজনৈতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করবে।
এটি ভবিষ্যতের অপরাধের প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করতে পারে।
আর্জেন্টিনার আদালত যদি সেই সামরিক ও বেসামরিক নেতাদের বিরুদ্ধে
গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে, তাহলে মামলাটি সম্ভাব্যভাবে তাদের
বিদেশ ভ্রমণের ক্ষমতা সীমিত করতে পারে।

যাইহোক, ২০২১ সালের জুলাই পর্যন্ত,
আমরা এখনও জানি না
আর্জেন্টিনার আদালত
মামলাটি চালিয়ে যেতে
রাজি হবে কিনা।

সামরিক অভ্যুত্থানের আগে, মিয়ানমার সরকার
আদালতের এখতিয়ার
প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং
বলেছিল যে তারা অভিযোগের
জবাব দেবে না।

মিয়ানমারের সহযোগিতার অভাবে
অধিকতর তদন্ত এবং
প্রমাণ সংগ্রহের কাজকে
আরও কঠিন করে তুলবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আর্জেন্টিনার আদালতে
হাজির করা কঠিন হতে পারে
(যেমন, প্রত্যর্পণ প্রাপ্তি), এবং
সেইজন্য বিচার করা
সম্ভব নাও হতে পারে।

হুমম...

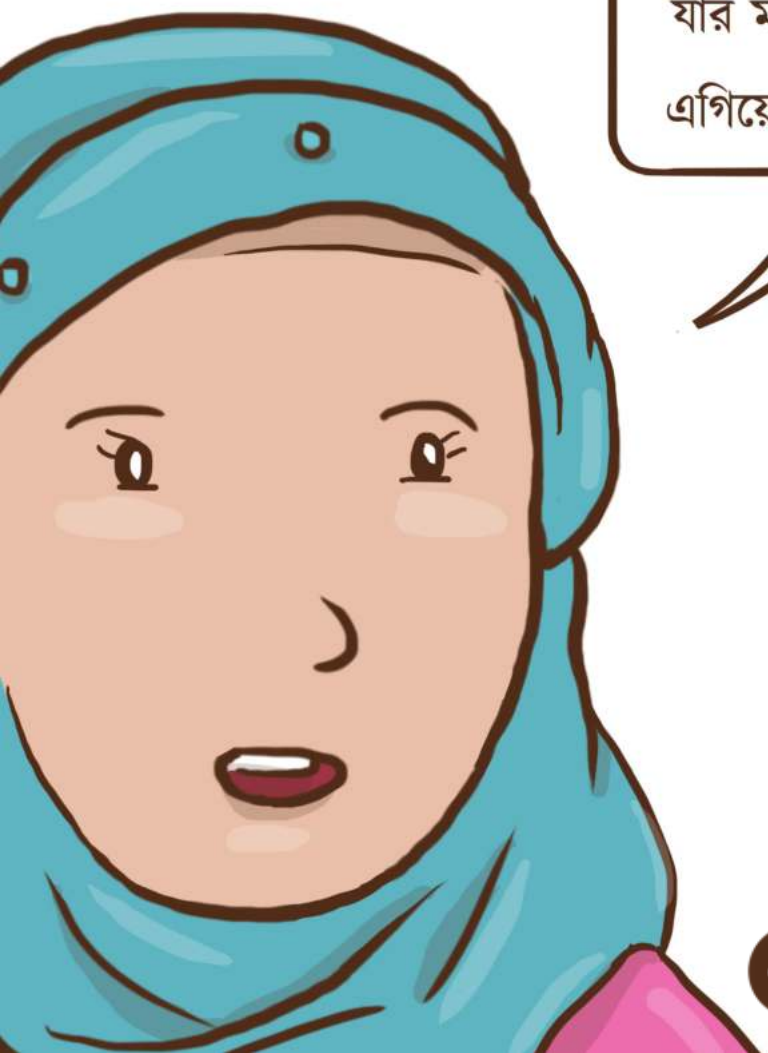
আসুন একটি উপায় খুঁজে বের করি
যার মাধ্যমে আমরা এই প্রক্রিয়াগুলোকে
এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারি।
আমরা যেসকল তথ্য শিখেছি
তা ছড়িয়ে দিতে পারি
যাতে আমাদের সম্প্রদায়ের
আরও মানুষ এসব বুঝতে পারে।

আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করতে পারি এবং
যারা অপরাধমূলক ঘটনাগুলো অভিজ্ঞতা করেছেন বা প্রত্যক্ষ করেছেন
তারা যেন সেগুলো প্রকাশ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে পারি ।

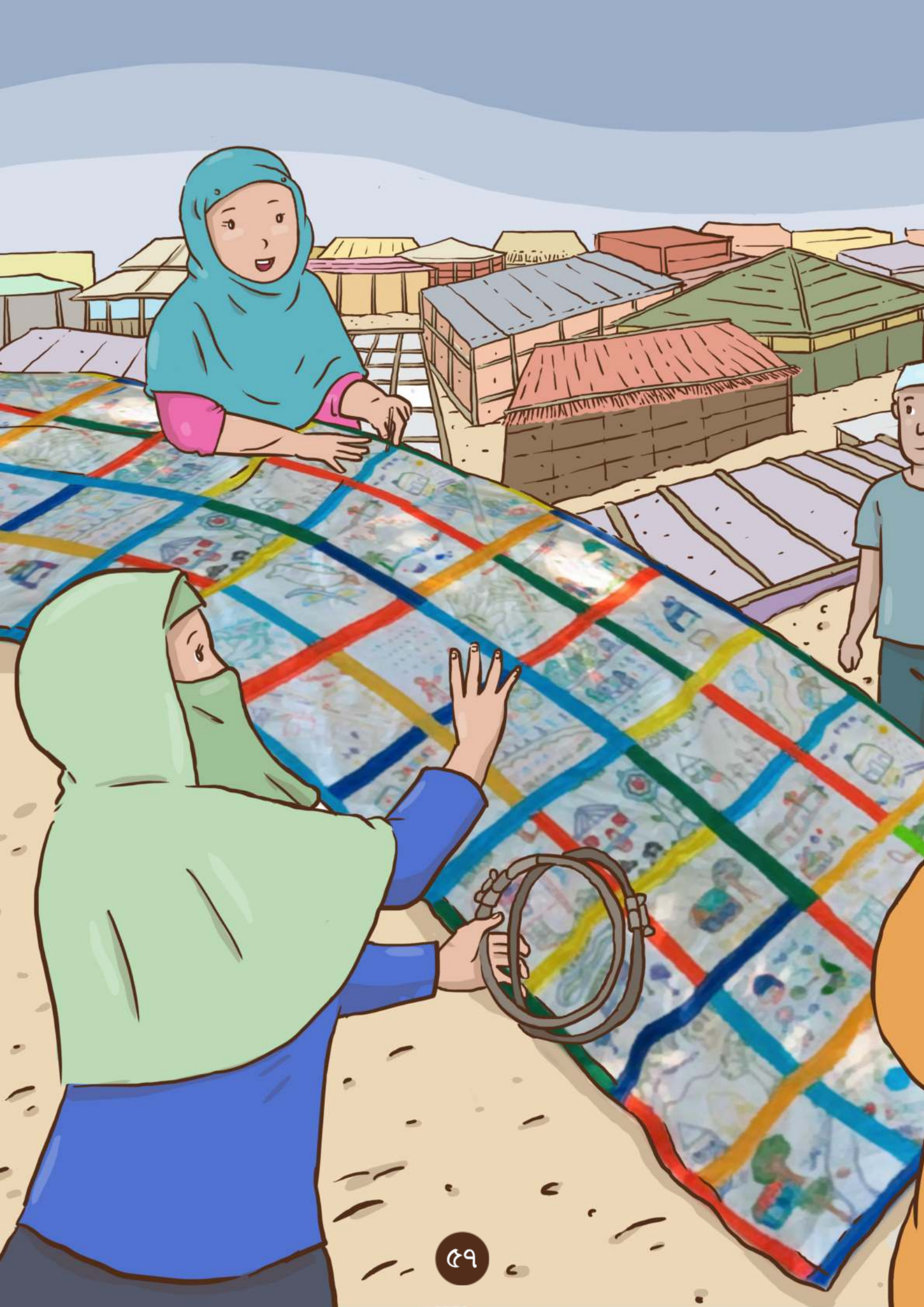

সবাই মিলে আমরা
পরিবর্তন আনতে পারি।
ন্যায়ের জন্য আরো একধাপ
এগিয়ে যেতে পারি।

AJAR

ASIA JUSTICE AND RIGHTS

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

Liberation War Museum
Bangladesh